মিতুর ভাণ্ডারের গল্প

এই লোকটাকেই তার সবচেয়ে বেশি করে চেনার কথা, অথচ ঘটে ঠিক তার উল্টো। ভাবে যখন, একটু মজা পায় মঞ্জরী, একটু ভয়ও করে — ওকেই সে সবচেয়ে কম চেনে বোধহয়। কোন কথায়, কোন কাজে যে ও কী ভাববে, কী করবে, কিছুই আগে থেকে বুঝে উঠতে পারে না। কই, অন্য কারুর সঙ্গে তো এমনটা হয় না তার। আর শুধু মঞ্জরী কেন, ওর নিজের বাড়ির লোকেরাও ওকে বুঝতে পারে না। তারা তো কত বছর ধরে ওকে দেখছে — ওর সব কিছুতেই ওকে কত খারাপ ভাবে। মঞ্জরী বোঝে, ও মোটেই খারাপ লোক না, বরং অন্য অনেকের চেয়েই অনেক ভাল, কিন্তু কেন যে অমন করে?

ছাদের ওই কোণটায় গিয়ে দাঁড়াতে, একা দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে, ও খুব ভালবাসে। ফাটাফাটা শ্যাওলা পড়া কোণটা, থামের গা ঘেঁষে। গোটা বাড়িটাই বেশ অন্ধকার, এতগুলো বড় বড় কাঁঠাল আর আমগাছ, আমের গায়ে মোটা অজগরের মত পঞ্চাশ বছরের চৈ লতা, চারদিক থেকে ঝাঁকড়া গাছগুলো ঝুঁকে এসেছে বাড়িটার উপর। ছাদের এই দিকটায় সারা বাড়ির অন্ধকার যেন জমাট বেঁধেছে। নিচে ভাঙা পাঁচিল, তার পর শুরু মিতুদাদের বাড়ির গাছ আর আগাছার জঙ্গল। ওই বাড়ির অন্য দিকটা একদম ফ্ল্যাটবাড়ির মত, কিন্তু এদিকটায় কোনো হাত পড়েনি। এখানে মিতুদার ঘর ছিল, মারা যাওয়ার আগে তিন-চার বছর কখনো বেরোয়নি ঘর থেকে। কেউ যেত না মিতুদার ঘরে, না বাড়ির না বাইরের। একমাত্র ও-ই নাকি রাত্তিরে ফিরে এসে যেত মাঝে মাঝে মিতুদার ওখানে, ওর ঘরে। এসবই মঞ্জরীর শোনা — বিয়ের অনেক আগের কথা এগুলো। ও-র কি এখানটায় দাঁড়ালে মিতুদার কথা মনে পড়ে? সেরকমই বোধহয় ভাবতে ইচ্ছে করে মঞ্জরীর। রোজ রাত্তিরে এখানে এসে ও দাঁড়িয়ে থাকে — তখন ওর দিকে তাকিয়ে কী একটা হয় মঞ্জরীর, কেমন ভাল লাগে, তাড়াতাড়ি চা দিয়ে আসে। আজকাল কজন আর মরে যাওয়া বন্ধুর কথা মনে রাখে। লোকে অবশ্য মিতুদার ব্যাপার নিয়ে, ওর যাওয়া নিয়ে, অনেক কিছু বলে।

আর, ও একটু অদ্ভুত-ও আছে। সেদিন মঞ্জরী যেই নতুন কেনা মোড়াটা দিতে চাইল, অমনি চটে গেল বোধহয়। মোড়াটা তো সংসারের টাকা জমিয়ে কিনেছিল ওর জন্যেই। রোজ রাতে ফিরে অতক্ষণ ও ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে ছাদের ওখানটায়, মঞ্জরীর কি দেখতে ভাল লাগে? মঞ্জরী মোড়াটা দিতে চাওয়া মাত্রই বলল, কই, আমি কখন দাঁড়াই? এবং, বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বোধহয়। কী বলবে মঞ্জরী, ওখানে দাঁড়ানোটা কি খারাপ?

ও সেদিন নিজের মনেই ছাদের ওই কোণে দাঁড়িয়ে গান গাইছিল, গোপনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মা-কে। ওর গলাটা তেমন মিষ্টি না, একটু ভাঙা ভাঙা, কিন্তু শ্যামাসঙ্গীতগুলো গায় যখন, কী একটা থাকে, গায়ের মধ্যে কেমন করে। খুব ভাল গান গায় যারা, তাদের গান শুনে যেমন হয়। ছাদে, ওর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল মঞ্জরী, শুনতে শুনতে মঞ্জরীর বুকের ভিতরে কেমন লাগছিল। ওকে রাস্তার মোড় ঘুরে

ঢুকতে দেখেই মঞ্জরী চা-টা চড়িয়ে এসেছিল, আগেই, এখন যেই চা-টা ছাঁকতে যাবে, পিছন ফিরতেই ও বলল, তোমার গান ভাল লাগে না, না? কী বলবে মঞ্জরী? বলল, আমি অত কী বুঝি গানের? মঞ্জরীর উত্তরটা ও ঠিক শোনেও নি, নিজের মনেই বলল, শুধু ওই কচুশাক কোটা আর কচুশাক রাঁধা নিয়েই বাঁচে না মানুষ — তাহলে ওই মা বা পুটুর মত হয়, বেনারস গিয়েও শুধু গয়না গোনে। বেশ একটু রাগ নিয়েই বলল।

মঞ্জরী কী বলবে এর উত্তরে? হাসিও পায়, আবার মাঝে মাঝে মন খারাপও হয়। আর এই যে গল্পটা ও বলে, সেটাও, কী এমন একটা ব্যাপার? ওর সঙ্গে ওর বাড়ির লোকের বেড়াতে যাওয়া তো দূরের কথা, ভাল করে কথা বলার সম্পর্কটাও নেই বহু বছর হল। তাই বলে কথা শোনাতে ছাড়ে না ওরা, ওকে তো পারে না, মঞ্জরীকে শোনায়। সে অনেক বছর হল, ননদ পুটুর বড় মেয়ের বয়েস এখন তেরো, সেই ননদের বিয়েরও আগে, একবার বেনারস গেছিল বাড়ির সবাই, বেনারসে এদের ব্যবসাও আছে, তখনকার কথা। সেখানে গিয়ে, সোনারপুরার একটা বাড়িতে উঠেছিল ওরা, যার ছাদে গেলেই গোটা গঙ্গাটা, কাশী সহরটা, চোখে পড়ত। আর সেখানে গিয়েও নাকি পুটু আর শাশুড়ি গয়না গুনেছিল, গঙ্গা না-দেখে। তা, গুনবে না লোকে, গয়নাগাঁটি, টাকাপয়সা, বিদেশবিভুঁইয়ে গিয়ে, সব ঠিকঠাক আছে কিনা?

ও নিজে তো উদ্ভট। বিয়ের পরপরই একটা ছোট্ট কানের ফুল হারিয়েছিল মঞ্জরী। গুজিটার প্যাঁচটা ঢিলে ছিল। একে বৃহস্পতিবার হারাল জিনিসটা, তায় সোনার জিনিস, বকা খাবে কিনা খুব ভয় পাচ্ছিল মঞ্জরী। অনেক থতমত খেয়ে যেই বলল হারানোর কথাটা, অমনি ও বলল, বেশ রেগে গিয়ে, কই দেখি। মঞ্জরী অবাক, মানে কী — কী দেখবে? অনেকক্ষণ ধরে তার ডান কানটা টেনে টেনে দেখল, তার পরে বলল, লাগেনি তো — ও শালার গয়না কানে যেন আর না দেখি। বোঝো। গয়না অবশ্য পরের দিন থেকেই মঞ্জরী ফের পরে, সেটা আর ও লক্ষ্যও করেনি।

গান, কচুশাক, এসব নিয়ে কতক্ষণ ধরে ও বকেই চলল মঞ্জরীকে। কিন্তু, কী রকম করে একটা আজকাল বুঝে গেছে মঞ্জরী, এই বকাটা আসলে অন্যরকম। মঞ্জরী ছাড়া অন্য কাউকে ও এসব বলতই না। তখন অন্য কিছু বলত। অনেক কম রেগে, আর একদম অন্য রকমের রাগ। বা, কিছুই বলত না। কচুশাকের কথাটা এমন করে বলল, শুনলে গা-জ্বালা করে। যেন নিজে মাছ ফেলে রেখে গোটা ভাতটাই কচুশাক দিয়ে খেয়ে ফেলে না। আর কদিন-ই বা হয় কচুশাক?

আসলে রাগটা অন্য জায়গায়। শেষ যে দিন কচুশাক হল, রাতে ও খেতে বসলে, কী ভুল করে মঞ্জরী বলে ফেলেছিল, তেঁতুল ঘষলাম কত, তাও হাতটা ভীষণ চুলকে যাচ্ছে সারাদিন। তখন মনে হল, শুনলই না, কী ভাবছে গোঁজ হয়ে, সবসময়ই তো সেরকমই লাগে ওকে। কিন্তু, রাতে, ভুলটা ভাঙল। মঞ্জরী তো আগে

গিয়ে শুয়ে পড়েছে, রোজই তাই হয়, মঞ্জরী এসে শুয়ে পড়ে, আর ঘন্টার পর ঘন্টা ছাদের ওই জায়গাটায় গিয়ে ও দাঁড়িয়ে থাকে, উপরের ছাদে, কয়েক ফুট নিচেই মিতুদার ঘর, সামনে আগাছা আর অন্ধকার। দু-চারদিন মঞ্জরী, নিচে, ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে, পাটকিলে কুকুরটাকেও দেখেছে। সবাই কুকুরটার কথা উঠলেই ভয় পায়, মঞ্জরীর কোনো ভয় লাগেনি। ওখানে ও দাঁড়িয়েই থাকে, গভীর রাত অব্দি, নিজের মনে বিড়বিড় করে কথাও বলে একটু আধটু, শুতে আসে মঞ্জরী ঘুমিয়ে পড়ার পর। সেইদিন রাতে, আধো ঘুমের ঘোরে মঞ্জরী টের পেল, ছোটো টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে তার হাতের পাতা উল্টে পাল্টে দেখছে ও। মটকা মেরে পড়ে ছিল, মঞ্জরী টের পাচ্ছে বুঝলে যদি চটে যায়। কখন যে কী হয়? কিন্তু বেশ লাগছিল। কাতুকুতুও লাগছিল, আর ভাবছিল, তার হাতটা যদি একটু সুন্দর হত, কত মেয়ের যেমন হয়, নরম নরম, ঠাকুরের আঙুলের মত। ছোটবেলার থেকেই তাকে এত কাজ করতে হয়েছে সংসারের।

মাঝে মাঝে ভয়ানক ভয় পেয়ে যায় মঞ্জরী। কী থেকে রাগছে ও, কেন রাগছে, কিছুই বুঝতে পারে না। আর রেগে গিয়ে সে যে কী ভয়ঙ্কর চেহারা হয়। তার ছেলেমেয়ে না-হওয়া নিয়ে শাশুড়ির বেশ নালিশ আছে, ওনার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছিলেন। কিন্তু ওইসব নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার কথা ভাবতেই পারে না মঞ্জরী, আরো চেনা ডাক্তার। কী করবে বুঝতে না-পেরে শেষ অব্দি ওকেই বলল। বলেই বুঝতে পারল, ভয়ানক ভুল করেছে, ওর নাক চোয়াল সব শক্ত হয়ে গেছে। একটু বাদেই ও মা-র ঘরে গেল, আর সেই হিংস্র গলাটা এখন চিনে গেছে মঞ্জরী, ওই বালের ডাক্তার, পেট খসায় বাল, ও বাঁড়া ডাক্তার নাকি?

বিয়ের আগেই কিছু শুনেছিল, বিয়ের পর আরো অনেক শুনেছে, একসময় মস্তান হয়ে গেছিল, খুব নেশাভাঙ করত, আরো কত কিছু। কী সত্যি কী মিথ্যে কে জানে। যাই শুনুক, বাপ-মা মরা ভাগনির বিয়ে না-দিয়ে কোনো উপায় ছিল না মামার, সত্যিই, মামারা নিজেরাই প্রায় খেতে পায় না এখন। তাদের পাড়ায় আসত ও, কী একটা জমির দালালির কাজে, নিজেই পছন্দ করেছিল মঞ্জরীকে, মামার সঙ্গে সরাসরি এসে কথা বলেছিল, এতে ভাল লেগেছিল মঞ্জরীর। কেউ একটা চাইল তাকে। মামা যখন জিগেশ করেছিল, কী দিতে হবে বিয়েতে, তখন নাকি বলেছিল, কেন, আমি কি খেতে পাইনা — আমার দেওয় শাঁখা-সিঁদুর-শাড়ি পরে বৌ উঠবে। মামার অবশ্য কথাটা ভাল লাগেনি। বলেছিল, আর কী বলবে, এক সময় তো মস্তানি করত, পরে শেয়ার টেয়ার করছে, পয়সাও করেছে এখন। সেই পয়সার সূত্রেই শুনেছে মঞ্জরী, বিয়ের পরেও, ওই মিতুদার ঘর আর তার মধ্যে লুকোনো টাকার কথা।

পদ্মমাসি, বুড়ি হয়ে গেছে এখন, একসময় এ বাড়িতে কাজ করত, মঞ্জরীকে খুব ভালবাসে, কত দূর থেকে আসে, এলেই মঞ্জরী কিছু খেতে দেয়, শাশুড়িকে লুকিয়ে, শাশুড়ি এসব আদিখ্যেতা পছন্দ করে না। সেই পদ্মমাসি একবার বলেছিল, লোকে তো কত কিছুই বলে, খুনোখুনির কথাও বলে, কিন্তু দাদার খুব মায়া আছে গো, ভিতরে ভিতরে। কিন্তু তাও, বাড়ির লোকের সঙ্গে, মা-বাবার সঙ্গে, ও রকম করে

কথা বললে খুব খারাপ লাগে মঞ্জরীর, লোকে তো ওকেই আরো খারাপ বলে, যত ঠিক কথাই বলুক। তাই রাতে, ও ছাদে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে যখন, ওই সময়টাই সবচেয়ে সহজে কথা বলা যায় ওর সঙ্গে, মঞ্জরী ওকে বলল, ওরকম করে কথা বল কেন? কী বলি, জিগেশ করেছিল ও। মঞ্জরী বলল, ওই যে ওই সব, বাল টাল বলছিলে না তখন?

মঞ্জরী ছাদের আলশের ওপারে মুখ ঝুঁকিয়ে নিচের রাস্তা, মিতুদার ঘরের ভাঙাচোরা দেওয়াল ভিত, গজিয়ে যাওয়া জঙ্গল, এই সব দেখছিল, দু-এক মুহূর্ত যে সবকিছু অদ্ভুত ভাবে নিস্তব্ধ হয়ে আছে সেটা খেয়ালই করেনি। তারপর অবাক হয়ে যেই ওর দিকে তাকাল, সেই মুখটা দেখেছিল মঞ্জরী। পরে অনেকবার ওই মুখটা মাথায় এলে পদ্মমাসির কথাটা মনে পড়ত। ল্যাম্পপোস্টটা অনেকটা দূরে, আলোটাও পড়ে তেরছা করে, সেই আলোতেও দেখেছিল মঞ্জরী, ভয়ঙ্কর সেই চোখ, জ্বলছে যেন। ও যেন অপেক্ষা করছিল মঞ্জরীর তাকানোর জন্যে। বলে উঠেছিল, মুখ-মাথা ছেঁচে দেব, আর একবার মুখে ওসব আনলে। শক্ত হাতের সামনে বাড়ানো শক্ত ওঁচানো আঙুলে করে সামনের থামটা দেখিয়েছিল, যেন সেখানেই ছেঁচে দেবে, ওর মুখ দেখে সত্যিই বিশ্বাস হচ্ছিল যে সেটা ও করতেই পারে। ভীষণ কান্না এসে গেছিল মঞ্জরীর, তাও, কোনোক্রমে বলেছিল, তুমি যে বলো। দূরে চলে যেতে যেতে, যেন মঞ্জরীর গায়ে হাত তুলে দেওয়ার ভয়েই ও চলে যাচ্ছে, বলেছিল, বৌ-মানুষরা, ভাল লোকরা, বলে না।

পরে মনে পড়ে মজা লাগে, তার মানে ও নিজেকে খারাপ, আর মঞ্জরীকে ভাল ভাবে, কী অদ্ভুত। কিন্তু তাই বলে ভয়টা যায় না। ওই মুখটা আর একবার দেখেছিল মামাতো বোন শিপ্রাকে যখন ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে। বিকেলবেলা পল্টন ফোন করে তাকে চেয়েছিল। জীবনে প্রথম সেটা মঞ্জরীর কোনো ফোন এল। পল্টন টেলিফোনেই ফোঁপাচ্ছিল, দিদির গায়ে কালশিটে করে দিয়েছে। কী বলবে বুঝতে পারছিল না মঞ্জরী। সামনে শ্বশুর-শাশুড়ি সবাই বসে টিভি দেখছে। তাদের সামনে কী বলতে কী বলে ফেলবে। কী করবে, তখন সন্ধে হয়ে এসেছে, যাবে কোথায়, টাকাও তো লাগবে, কান্নাটাও আসছিল না মঞ্জরীর, ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে। বারবার শিপ্রার মুখটা মাথায় আসছিল, শিপ্রার পেটের বাচ্চাটার কথা। ও কখন উপরে এল, মঞ্জরী টেরও পায়নি। ও সোজা মঞ্জরীর দিকেই এল। মঞ্জরীর প্রথম মাথায় এল যে, আজ চা বসানো হয়নি। কিন্তু ও বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা, কেমন করে কে জানে। জিগেশ করল, কী হয়েছে?

একটা দুটো কথা বলতে না-বলতেই ও খুলতে-থাকা জামাটা ফের গায়ে চড়াল। একবার খুব নিচু গলায় বলল, খানকীর বাচ্চা, নিজের বৌ শালা। জামা পরতে দেখে মঞ্জরী কিছু একটা জিগেশ করতে গেছিল, সেই মুহূর্তে ফিরে তাকিয়েছিল, সেই চোখ, পাকানো হিংস্র, আঙুল-হাত উঁচু করে চুপ করতে বলেছিল মঞ্জরীকে। ফিরেছিল গভীর রাতে। একটা কথাই বলেছিল ফিরে, তারক আর মারবে না, আর কাল এসে নিয়ে যাবে। তারপর কাগজে মোড়া দুটো প্যাকেট বার করেছিল, টাকার। ছোটটা তার হাতে দিয়ে

বলেছিল, কাল সকালেই যেও, টাকা না, ফলটল নিও, আর এইটা রইল, যা লাগে যখন। ওর বাইরের জামাকাপড় কাচার জন্যে ভিজিয়ে এসে, টাকার প্যাকেটদুটো তুলতে তুলতে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিল মঞ্জরী। শিপ্রার জন্যে না। কাঁদতে তার ভাল লাগছিল।

ওর কথা মাথায় থাকে বলেই, শাশুড়ির ননদের কোনো কিছু আর গায়ে লাগে না মঞ্জরীর। শুধু মঞ্জরীরা গরীব বলেই যে ওরা করে ওরকম, তা না, নিজেদের ঘরের ছেলের উপর যতই রাগ থাক, সেগুলো সামনে তো বলতে পারে না, ভয়ানক ভয় পায় ওকে, মঞ্জরীর উপর এসে ঝেড়ে যায়। এতে একটা মজাও পায় মঞ্জরী। পুটু তার চেয়ে বয়সে ছোটো, সম্পর্কেও, তাও কখনো বৌদি বলে ডাকে না। বিয়ে করে এ বাড়িতে আসার পর পুটু নিজে আসেনি, একটা বেশ দামি শাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। খাটের উপর শাড়িটা দেখে ও বলেছিল ঠিক ওই দামের একটা টাইটান কিনে পুটুর জন্যে পাঠিয়ে দিতে, আর শাড়িটা বাড়ির কাজের লোককে দিয়ে দিতে। তা মঞ্জরী তো আর ওর মত পাগল না। আবার শাড়িটা সে পরেও নি। পুটুর ছেলের বয়স সাত বছর, রাজন, খুব ভালবাসে মঞ্জরীকে। ওদের কম্পিউটার আছে, তাই দিয়ে রাজনের বাবা বিদেশে গেলে কী করে রাজন ইমেল করে, চাইলে কী রকম গান ছবি সবই পাঠিয়ে দিতে পারে, সেসব শোনায় মঞ্জরীকে, মঞ্জরী যতই অবাক হোক, কিছুতেই আশ মেটে না রাজনের। মঞ্জরীর নাক টেনে মাথা টেনে সব শুনিয়ে ছাড়ে। তাই দেখে পুটু একদিন খুব বকেছিল রাজনকে, ও কী রকম জংলি ব্যবহার? এসবের খুব বাড়াবাড়ি পুটুর। এমনকি বাড়ির লোক পুটু বলে ডাকতেও পারে না বাইরের কেউ থাকলে। পুটুর মেয়েটাও আসে না তাদের ঘরে, তাদের ঘরটা তো বাড়ির মধ্যে হয়েও আলাদা, একটেরে, ছাদের উপর। ও নিজেই বানিয়ে নিয়েছে। ব্যবসায়ী বাড়ির সম্পত্তির ঝামেলা না-থাকলে ওকে হয়তো বাড়ি থেকে আলাদা করেই দিত। পুটুর বর বেশ ভাল। প্রদীপদাদের এক্সপোর্টের ব্যবসা, দেশবিদেশে যেতে হয় প্রায়ই, এলে জিগেশ করে মঞ্জরীকে, কি বৌদি, বাইরে থেকে এবার আনব কিছু, কি মেয়ে আপনি, লিপস্টিক, পারফিউম, মানে, সেন্ট — এসব কিছু লাগান না? প্রদীপদা জিগেশ করে, সারাদিন একা একা বসে থাকেন এই চিলেকোঠার ঘরে, গল্প করার কাউকে তো পান না? মঞ্জরী তো বলতে পারে না, একটুও সে একা থাকে না, বাবা আসে প্রায়ই, সন্ধের পর, বড়পিসিও, এসব তো বলা যায় না লোককে।

প্রদীপদা এলেই এই বাড়িতে একটা সাজো সাজো রব পড়ে। এবং তখন মঞ্জরীরও ডাক পড়ে, এটায় মজাও পায় মঞ্জরী। তার শাশুড়ি ননদ দুজনেই কিচ্ছু কাজ পারে না, আলসেও খুব। সব কিছুই কাজের লোককে দিয়ে করায়। কাজের লোক দিয়ে কি আর ভাল রান্না হয়? প্রত্যেকবার প্রদীপদা তার বানানো খাবারের কথা শত মুখে বলে যায়। ওই সমস্ত রান্না তাকে বাবার শেখানো। মা মারা গেছিল মঞ্জরী হতে গিয়ে। বাবা তার ছোটবেলায় ওগুলো তাকে করে খাওয়াত। এখনো সে যেই ভুলে যায়, বাবা ধরিয়ে দেয় এসে, বকাবকিও করে ভুলে যায় বলে। সেদিনও তাই হল। সেদিন অবশ্য বাবা রান্না শেখাতে আসেনি।

এসেছিল মঞ্জরীর মন-খারাপ বলে।

ছেলেমেয়ে নিয়ে পুটু এসেছিল বিকেলে। প্রদীপদা আসবে রাতে। প্রদীপদা আসার আগেই শাশুড়ি তাকে জানিয়েছিল, বিকেলে মুখরোচক কিছু একটা করতে। প্রদীপদা মাংস ভাল খায়, অথচ পাঁঠার মাংস বারণ হয়ে গেছে। কী করবে? মুরগির মাংস দিয়ে কী রান্না করে? শেষে বাবাই বলে দিল, হিং পাতিলেবু আর ভিনিগার দিয়ে মাংসটা মেখে রাখ। পরে চালের গুঁড়ো লঙ্কাকুচি দিয়ে ভেজে দিলে, পরোটা দিয়ে খুব ভাল লাগবে, তেলও কম টানে, শরীরের কোনো ক্ষতি হবে না, বলেছিল বাবা। এটা বাবার নিজের বানানো রান্না। কী করে নতুন রান্না মাথায় আনে, কে জানে? সে তো রোজই রান্না করে, কই তার তো মাথায় আসে না একটাও নতুন রান্না?

রাজন এসেই ফরমাস করেছিল, মামি, লুচি খাব। তারপরেই বলেছিল, কাগজ দাও, আমি ছবি আঁকব। হাতে নিয়ে মঞ্জরীকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল, এই দেখো শুধু হলুদ রং-ই ছটা, ভাবা যায়, বল তো? এক ব্যাগ রং করার পেন, মার্কার বলে, বাইরে থেকে এনে দিয়েছে বাবা, গর্বের সঙ্গে তাকে দেখিয়েছিল রাজন। ছবি আঁকার অত কাগজ আর পায় কোথায় মঞ্জরী? একটা বিরাট ক্যালেন্ডারের বারোটা ছবি রেখে দিয়েছিল তুলে। খুব ভাল লেগেছিল দেখতে, পরে কখনো বাঁধাবে বা অমন কিছু একটা করবে বলে ভেবেছিল। ছবিগুলো দেখলেই মন কেমন ভেসে যেত তার। গভীর সমুদ্রের জলের নিচের নানা ছবি, বিদঘুটে দেখতে নানা রঙের মাছ, আলো-বেরোনো পোকা আর গাছ — এইসব। সে বাঁধানো আর কবে কী হবে ঠিক নেই, হয়তো পড়ে পড়েই নষ্ট হবে ছবিগুলো, তাই তো হয়, রাজনের জন্যে বরং কাজে লেগে গেল কাগজগুলো।

পুরো ঘর মেঝে জুড়ে কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে রাজন। সব কিছু একাকার। তার মধ্যে তার প্লেট বাটি গেলাশ। সে চা খাবে, তাই, দুধ গুলে তাতে নমো নমো করে লিকার মিশিয়ে, দিতে হল তাকে। একবার বলে বিস্কুট খাবো, একবার বলে খাবো না। শেষে লুচি, তার সঙ্গে সে চিনিও খাবে, আবার তরকারিও খাবে। মুহুর্মুহু একটা করে বিদ্ঘুটে ছবি আঁকছে, এবং প্রত্যেকটা আঁকা চলতে চলতে আর আঁকা শেষ হলেই মঞ্জরীকে মতামত দিতে হচ্ছে, কী হল, কেমন হল, আর ঠিকঠাক মতামত না-দিতে পারলেই বেধড়ক বকুনি। সব মিলিয়ে এক যাচ্ছেতাই অবস্থা। মঞ্জরীর মনে হচ্ছিল, ঘরটা যেন ভরে আছে এরকম করে ভরেনি আগে কোনোদিন।

এই সময় পুটু এল ঘরে। মঞ্জরী প্রথমে খেয়ালও করেনি, একটা আওয়াজ পেল, ঘরের ভিতরকার একটা টুল সরানোর। রাজনের শেষ ফরমাস, ছোট লুচি চাই, পিঁপড়েদের জন্যে। কত ছোট? মার্কারের মুখের মত। মার্কারের মুখের সাইজের লুচি ভাজছে তখন মঞ্জরী, পিঁপড়েদের খাওয়া দাওয়া নিয়েও তো ভাবতে হবে। তারপরেই গলা পেল পুটুর, এই আলমারিটা নতুন কিনলে, ছিল তো একটা? মঞ্জরী বুঝে উঠতে

পারল না, ঠিক কী বলবে। বলল, ও, এসো, লুচি খাবে একটু? পুটু বলল, কত দাম পড়ল? মঞ্জরী জানে দামটা, কিন্তু বলতে ইচ্ছে করল না তার। বলল, ঠিক তো জানিনা, ও কিনেছে। ও, বলল পুটু। তারপরেই তার চোখ পড়ল রাজনের দিকে, কী ব্যাপার, তুই লুচি খাচ্ছিস এখন, রাতে কি খেতে হবে না, তুমিই বা আমায় না-জিগেশ করে ওকে দিলে কেন, কালকে রাতেও অ্যাসিড হয়েছে ওর, এতটা চিপস খেয়েছে একটু আগেই। রাজনকে প্রায় হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল পুটু।

ঘর জুড়ে ছড়ানো কাগজ, ছবি, প্লেট, বাটি, গেলাশ, প্লেটের আধখাওয়া লুচি, মেঝেতে চিনির রেখা, চলকে পড়া সাদা রঙের চা। আর কড়াইয়ে লাল হয়ে আসছে পুতুল পুতুল লুচি, তাদের আর তোলার দরকার হবে না। তেল ফুটে যাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে গ্যাসের নবটা অফ করে দিল। দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জরী, হাতের উপর ওজন, সামনে ঝুঁকে, গ্যাসের উনোনের উপর ঝুলে থাকে তার মাথা বুক শরীর। দাঁড়ানোর চেনা ভঙ্গী এটা, একটা কোনো আরাম দেয়। এই ভাবে সে অনেক ঝুঁকেছে। তিনমাসের মধ্যে পরপর বড়পিসি আর বাবা। চলে আসতে হল মামার বাড়ি। তখন তবু আশা ছিল বাবার বকেয়া গ্রাচুইটির টাকাটা পাওয়া যাবে। মামা-মামীর নিজের সমস্যাও তো কম ছিল না। মাঝে মধ্যে কষ্টটা খুব বাড়ত। মা-কে তার মনে নেই, ছোটবেলা থেকে বিধবা বাতিকগ্রস্ত বড়পিসিকে মনে আছে, রেগে গেলে কোনো জ্ঞান থাকত না, যা মুখে আসে তাই বলত। মামাবাড়ির কয়লার উনোনের উপর ঝুঁকে, নানা দিকে ডালপালা ছড়ানো হলুদ আগুনের একটা গাছ ছড়িয়ে গেছে কাল কাল ফোলা ফোলা গুলের গুহার মধ্যে, আগুনের গাছটা দেখে চলার মধ্যেই একটা আরাম, আরো ঝুঁকে যেত মঞ্জরী, তখন সেই পিসির কথাই খুব মনে হত তার। সেটাও এরকমই সন্ধে, গত এক ঘন্টা ধরে শিপ্রা গেয়ে চলছে, আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি, বিয়ে তো তাকে করতেই হবে, এমনকি মঞ্জরীর চাইতেও দু-তিন পোঁচ কাল শিপ্রা, নীল শাড়ি পরতে পারে না, নীল শাড়ি নেইও, মায়া হয় মঞ্জরীর। কড়াইয়ের উপর মাথা ঝুলে থাকে মঞ্জরীর। গ্যাস নেভানোর পর, কড়াইয়ের তেলতেলে ধোঁয়া ক্রমে কমে গেছে, তেলের মধ্যে ভাসছে ব্যান্ডেজের ব্যবহৃত নোংরা তুলোর মত তিনটে লুচি, পিঁপড়ের জন্যে। কুঁকড়ে, চুপসে গেছে। কেন অত কষ্ট করে নিখুঁত গোল করার চেষ্টা করল মঞ্জরী? কেন?

মাথার তালুতে পিছনে পাঁচ আঙুলের একটা পরিচিত চাপ টের পেল মঞ্জরী। পিছন ফিরে না তাকিয়েই মঞ্জরী বলল, রাজনকে নিয়ে গেল। ও যাক, আবার আসবে। বাবা কোনো পাত্তাই দিল না তার কথায়। মঞ্জরী বলল, কবে আসবে আবার, কে জানে। বলেই মনে হল, এটা তো সে বলতে চায়নি। এরকমই হয় তার, ঠিক কথাটা ঠিক সময়ে মনেই আসে না। বলে বোঝে, এটা তো বলতে চায়নি।

বাবাই তাকে মনে পড়াল, কী হল, খাবার বানাবি না? অনেক সময় ধরে প্রদীপদার আর অন্য সবার জন্যে খাবার বানিয়ে চলল মঞ্জরী, পরোটা আর হিং-মাংস। বাবা মনে করিয়ে দিল, পরোটার ময়দা মাখতে গরম জল চাপা, তোর মনে আছে তো, সবচেয়ে নরম করে মাখতে হয় পরোটার জন্যে — সব কিছু শুধু ভুলে

যাস। ময়দার পরিমাণ বাড়াতে বলল বাবা, ওইটুকু ময়দায় অত জনের কী হবে? ময়দা বাড়াল বটে, কিন্তু জানত মঞ্জরী, আজ পুটু বা শাশুড়ি বা পুটুর মেয়ে ওরা কেউ খাবে না এই খাবার, প্রদীপদাকে তো দিতেই হবে, বাবাকে বলতে খারাপ লাগছিল তার, শশুরবাড়ির কথা। কী থেকে কী ভেবে নেবে কে জানে। তার জন্যে চিন্তা করবে। আর সে তো আসলে সত্যিই খারাপ নেই, অথচ বাবা তাই ভেবে নেবে। পুটুদের এই না-খাওয়ার ব্যাপারটায় নিজেকেওএকটু দোষী লাগছিল তার। আলমারির দামটা সে ইচ্ছে করেই বলেনি। এরকম হবে জেনেও। বললেই তখুনি শুরু হয়ে যাবে ওই একই বাঁধা গত। মিতুদার জমানো টাকার কথা, তাই নিয়ে নানা কথা। টাকা জমানোটা তো একটা অসুখ ছিল মিতুদার। নইলে টিবি আজকাল কোনো রোগ একটা? মুখ দিয়ে রক্ত উঠত, তবু একটা খাবার খেত না। সেই টাকাগুলো সব কী হল? টাকা তো আর উবে যায় না?

পুরো সময়টা পুটু কথা বলে যাবে মিতু মিতু করে। অথচ ওর দাদার বন্ধু, মিতুদা বলা উচিত, মঞ্জরী না-চিনেই, নিজের মনেই যেমন বলে, আসলে কিছুই শেখেনি। তার কী, ভাবে মঞ্জরী, যে যাকে যা খুশি বলুক। মঞ্জরী নিজে কোনোদিন ভেবে মিতুদা বলেনি, এমনিতেই এসেছিল। একদিন কী কথায়, ওকে জিগেশ করেছিল মঞ্জরী, আচ্ছা, নিজে নয় খেত না, তোমরা মিতুদাকে জোর করে খাওয়াতে না কেন? ও কেমন একটা অবাক হল, মঞ্জরীর দিকে চেয়ে রইল একটু। মঞ্জরী তো ওর সঙ্গে একটু ভয়ে ভয়েই থাকে, ভাবল, আবার কিছু গন্ডগোল করে ফেলল না তো? কিন্তু ওর মুখ দেখে রেগে গেছে বলেও মনে হচ্ছিল না। কেমন একটা অদ্ভুত মুখে মঞ্জরীকে বলল, তুমি তো মিতুকে দেখনি কখনো? মঞ্জরী মাথা নাড়ে — না জানায়। কিন্তু আজকাল চিনে গেছে মঞ্জরী, এগুলো আসলে ও জিগেশ করে না, নিজের মনেই বলে, এই কথাগুলোর উত্তর দেওয়ার কোনো মানে নেই। মঞ্জরীর উত্তরটা শুনল কি শুনল-না কে জানে, ও জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল একটু। অন্ধকার রাত, গাছের ঝাঁকড়া ডাল, রাস্তার পোস্টে মিয়োনো আলো। শেষে কেমন একটা উদাস গলায় বলল, তুমি কত ছোটো আমার চেয়ে। তারপর হাত বাড়িয়ে ঘেঁটিটা ধরল মঞ্জরীর, ঝাঁকাল, বেশ জোরে। ও তো কোনো কিছুই তো আস্তে করতে পারে না, বেশ ব্যথা লাগে মঞ্জরীর, আবার এই সব অদ্ভুত কাজে মজাও পায়। পাছে এই মজা পাওয়াটা নষ্ট হয়ে যায়, চুপ করেই থাকে। ওর বিরাট হাত, গায়ে জোর কত, গুন্ডামি করত একসময়, পকেটে একটা আঙুলের আংটা লাগানো গিঁট গিঁট স্টিলের পাত নিয়ে ঘুরত, এখনো আছে সেটা, পাঞ্চমার্ক নাম, নিজেই দেখিয়েছিল একদিন, এখন হাত বাড়িয়ে তুলে আনে মঞ্জরীকে নিজের কোলের উপর। রাত যথেষ্টই, তাও, জানলা খোলা বলে খুব লজ্জা পায় মঞ্জরী, বলে, উঁ-উঁ-জানলা। ওর স্বাভাবিক কর্কশ গলায় বলে ও, তাতে বাল কী হয়? আবার এই বলতে বলতেই, মঞ্জরীকে কোলে নিয়ে জানলার সামনে থেকে বিছানার কোনায়, দেওয়ালের দিকে সরে যায়। এক সময় নাকি ব্রণ থেকে খুব ঘা হয়েছিল, গোটা গাল দুটো উঁচুনিচু, অসমান। সেখানে নিজের কানটা ঘষে একটু মঞ্জরী, কোলের মধ্যে ঘেঁষটে আসে। ও ডান হাত দিয়ে মঞ্জরীর পা-দুটো একটু গুটিয়ে তুলে আনে নিজের কোলে। মাথাটা একটু পিছিয়ে দেয়, যাতে

মঞ্জরীর মুখটা ওর গলার খাঁজে ঢুকে আসতে পারে। মঞ্জরীর মনে পড়ে, ভাত ঠান্ডা হচ্ছে। যাক গে, ভাবে মঞ্জরী, আর এক বার করে নেবে। ভগবানের ইচ্ছেয়, চাল বাড়ন্ত নয় তাদের।

হাত বাড়িয়ে বিছানার পাশের দেওয়ালে সুইচটা অফ করে দেয় মঞ্জরী। ওর বোধহয় পছন্দই হয় সেটা, বুকের হাতের কাঁধের নড়াচড়া থেকে যা মনে হয় মঞ্জরীর। ছাই, বলে না তো কিছু। অনেকটা সময় চুপ করে থাকে দুজনেই। ওর শরীর স্থির পুরো, মঞ্জরী ওর মুখে গালের চামড়ার ছোটো ছোটো কর্কশ দাড়ির নিচে পুরোনো ব্রণর ওঠানামায় আঙুল বোলায়। অনেকটা সময় দুজনের কেউই কোনো কথা বলেনি। মঞ্জরী ওর একটানা শ্বাসের ওঠানামা শুনতে পাচ্ছিল, নিজের শ্বাসের, টেবিলের টেবিলঘড়ির টিকটিক, কোথাও দূরে একটা রিক্সার হর্ন, রাতচর পাখি একটা ডাকল কোথাও। এই ডাকটা প্রায়ই শোনে মঞ্জরী। তখন ও থাকে না। বা, মঞ্জরী বিছানায় শুয়ে, আর ও ছাদের ওই কোনাটায়। ডাকটা শুনলে গা-ছমছম করে। এখন, ওর বাঁ-হাত মঞ্জরীর পিঠ ঘুরে এসে ধরে রয়েছে মঞ্জরীর বাঁ-হাতটা, আবার ওর ডান-হাতটাও মঞ্জরীর গা ঘুরে এসে ধরে রেখেছে ওরই বাঁ-হাতের কব্জি, মঞ্জরীর ওজনও এখন মঞ্জরীর না, এখন ডাকটা শুনে বরং একটু করুণই লাগল। আহা রে, পাখিটা কী খুঁজছে কে জানে?

যেমন প্রায় সবসময়ই ও কথা বলে নিজের মনে, এখনও তাই বলল, মিতু ঠিক তোমারই মত ভাল ছিল, খুব পয়া — যা ধরত, তাতেই টাকা আসত। নিজের ঘুম পেয়ে যাওয়া বাঁ-হাতের আঙুলগুলো ওর গাল থেকে বারবার এলিয়ে আসছে, পড়ে যাচ্ছে যেন, এবার ওর ঘাড়ের পিছনে আটকে নেয় মঞ্জরী। নিজের ঘাড়টা এলিয়ে দেয় ওর কাঁধে। আরাম লাগছে খুব, ভাল করে মঞ্জরী আর শোনেও না ও কী বলছে। ঘুম এসে যাচ্ছে মঞ্জরীর। ও বলে, এখনও মাঝে মাঝে ওই কুকুরটা আসে, মিতুর ঘরে যাই, যেখানে আগেও বসতাম, পরের দিনই শেয়ারগুলো একদম ঠিকঠাক লাগে। ও কী বলছে এটা আর শুনছে না মঞ্জরী, কিন্তু ও যে কথা বলছে, এটা ভাল লাগছে তার, শুনে চলতে ভাল লাগছে।

ঠিক এই ভাবেই যেন সেদিন মঞ্জরীর বসার কথা ছিল, এই ভাবেই ঘুমিয়ে পড়ার কথা ছিল, নিজেকে ভুলে গিয়েই। বাবা যেমন একসময় তার সমস্ত কথা ভেবে দিত। মঞ্জরীর নিজেকে আর ভাবতে হত না। এখনে দেয়। বারবার আজ বাবা তাকে তাড়া দিচ্ছিল, ওরে লোকগুলো খাবে, ঝটপট কর। নিজেই তুলে দিচ্ছিল থালার উপর, আবার খেয়াল করাল, সঙ্গে একটু পেঁয়াজ আর শশা কাট — কী রে। সব গুছিয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেও আবার ফেরত এল মঞ্জরী। বাবাকে মনে করিয়ে দিতে, প্রদীপদা এখন খাওয়ার পর যে কোনো সময় উপরে আসতে পারে, প্রত্যেকবারই তাই করে, খাওয়ার পরে দেখা করে যায়। কিন্তু, দু-পা নেমে ফিরে এসেই দেখল, বাবা চলে গেছে, মঞ্জরীর ঝামেলা উদ্ধার হয়ে গেছে, আর থেকে কী হবে? শাশুড়ির তখন একবার ডাক দেওয়া হয়ে গেছে, আর দাঁড়াতে পারল না মঞ্জরী।

পরে, এখন, বাড়িটা নিস্তব্ধ, চুপচাপ বসে থাকে মঞ্জরী ছাদের কোনায়। ও এখনো ফেরেনি। মঞ্জরীর

চোখটা এখন খোলাও না, বন্ধও না। চোখের মধ্যেটা এখন সন্ধের আকাশের মত হয়ে আছে। রাজনের ছেটানো কাগজগুলো তুলে দিয়েছে, খুব কষ্ট হচ্ছিল মঞ্জরীর, তাও। ও এসে সব ছড়ানো ছেটানো দেখলে কী ভাববে কে জানে? বাবাকে রান্নাঘরের মধ্যে পরার জন্যে একটা হাওয়াই চটি এনে দিয়েছিল মঞ্জরী। মঞ্জরী জানে, যেখান থেকে চটিটা এনে দিয়েছিল, এখন চোখ মেললেই দেখতে পাবে, ঠিক সেখানেই আছে চটিটা, বাথরুমের দরজার পাশে, রোজ চানের সময় ঘরের চটিগুলো ধুয়ে দিয়ে যেখানে রাখে, বাবাই শিখিয়েছিল, তাই বাবার নিজের তো ভুল হবেই না, আরো মেয়ের শ্বশুরবাড়ি, বেশি সাবধান থাকবে।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর একটু খসখস খসখস শব্দ পেল মঞ্জরী। নিচে, আগাছার জঙ্গলের দিকে। মঞ্জরী যেন আন্দাজ করতে পারছিল কী দেখবে। ল্যাম্পপোস্টের মরা আলো, রাতের আকাশের অন্ধকার আলো, চিকচিক করতে থাকা একটু ভিতু শ্বাপদ চোখ, নিচের মিতুদার ভাঙা ঘরের আগাছার জঙ্গলে কুকুরটা একটু পিছিয়ে গেল তাকে দেখেই। বোঝো অবস্থা। ওই লোকটাকে সবাই ভয় পায় আর ওই কুকুরটা পায় না, এদিকে এত ভিতু যে মঞ্জরীকে দেখে ভয় পাচ্ছে। লোকে এই কুকুরটাকেও ভয় পায়। মিতুদার মরার রাত্তির থেকেই নাকি আসে কুকুরটা, পদ্মমাসি বলেছিল। কই, বরং, কুকুরটাই তো ভয় পাচ্ছে, মঞ্জরীর তো কোনো ভয় হচ্ছে না?

আজ কুকুরটার জন্যে একটু মায়া হল মঞ্জরীর। ওরা কেউ কিছু খায়নি, প্রদীপদা ছাড়া। লোকে খায়নি, এই খাবার আর ওর জন্যেও রাখবে না, বরং কুকুরটাকে একটু দিয়ে আসি, মনে হল মঞ্জরীর। নিচে গিয়ে, আগাছার জঙ্গলের দিকে এগোতেই কুকুরটা পিছিয়ে ঢুকে গেল আরো ঝোপঝাড়ের ভিতর। আহা বেচারা, ভয় পাচ্ছে, খাবারটা ওখানেই নামিয়ে দিল। বলল, এই, তোকে দিলাম, খেয়ে নে। পুটুর উপর রাগটা তখনো যায়নি মঞ্জরীর। একবার মনে হল, পুটুর নাম করেই খাবারটা দেয়। তারপরেই মনে হল, ছি অত রাগতে নেই। আবার বলল, নে, তোরটাই খা তুই। উপরে যেতে যেতে মনে পড়ল মঞ্জরীর, আজ আবার এল কুকুরটা, তার মানে আজ আবার ভাল লাগবে ওর।